# elv- GKvj I †mKvj

†gRevnDwÏb RI‡ni

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চারটি মাত্র ঋতু। সেসব দেশে শীত ও গ্রীষ্ম খুব প্ররাক্রমশালী। প্রতাপশালী এই দুই মহারথীর মাঝখানে বাফার স্টেটের মতো আর দুটো ঋতু – অটাম বা ফল্ (ঋধষষ) এবং স্প্রীং কোনমতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে মাত্র। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশে। ‘ডিউ’ বা হেমন্তকাল এবং ‘রেইনি সিজন’ বা বর্ষাকাল নামে আরও দুটো ঋতু আমাদের ঋতাঙ্গানকে আলো করে রেখেছে। শরৎ বলুন, হেমন্ত বলুন কিংবা বসন্তই বলুন- একেক জনে যেন একেকটি লাজুক স্বভাবী কিশোরী। নিজেদের অস্তিত্বকে জাহির করতে কোন সাড়ম্বর সমারোহের বালাই নেই; নিভৃতেই আসে, নিভৃতেই চলে যায়। কিন্তু বর্ষার কথা আলাদা, নিজের আগমনের প্রমান রাখতে আকাশে বাতাসে হাজারটা সমারোহের বিশাল আয়োজন। ঢাক-ঢোল, বাজনা-বাদ্যি, বিদ্যুতের আলোকসজ্জা, রাতদিন অঝোর ধারায় ক্রন্দন, প্লাবন-বন্যা- আরও কতো কি। আমি এসেছি কেউ জানলো না কেউ দেখলো না- তা কি হয়? আমার আসা তো আসা নয়- এ যে আবির্ভাব, সকলকে তা মেনে নিতেই হবে- বর্ষারাণীর মনোভাব অনেকটা এরকম। বাংলাদেশে বাস করবে আর মহারাণীকে মান দেবে না- তা হয় না। সুতরাং আমাদের জীবনে আমাদের চেতনায় বর্ষার অস্তিত্ব নিবিড়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

ব্যক্তিগতভাবে বর্ষা আমার ঘোরতর অপছন্দ। ভেজা, স্যাৎস্যাতে, কাপড়চোপড়ে ছ্যাতা পড়ে যায়, সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেনের পানি উপচে উঠে মানুষের বাড়িঘর ডুবিয়ে দেয়। ছিঃ, এমন একটা বিশ্রী ঋতু নিয়ে কেউ আদিখ্যেতা করে? কিন্তু একটা ঘটনায় বর্ষার উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বিষয়টি খোলাসা করে বলা দরকার।

আমার এক মামা- কিয়াম। ভারী জ্ঞানী লোক। বাল্যকাল থেকেই তার অসধারণ প্রতিভার স্ফুরণে গ্রামের লোক হতবাক। এই ছেলে বড় হয়ে ওসি-ডিসি কিছু একটা হবেই- সকলের এরূপ বিশ্বাস। একদিন হঠাৎ করে মামা উধাও হয়ে গেলেন- একেবারে নিরুদ্দেশ। নানী শোকে পাথর হয়ে গেলেন। নানীর সই ফোকলার মা পানদোক্তার রসে ঠোঁট লাল টুকটুকা করে সহানুভূতি জানালেন- ‘পোলা না শত্তুর ! আমার ফোকলা লেখাপড়া না করলে কী হবে, মরে গেলেও মায়ের মনে এ্যাত বড়ো দাগা দিতে পারবে না। ঝাটা মারি অমন লেখাপড়ার মুখে’।

ফোকলার মা’র ঝাটার ভয়েই হোক কিংবা পার্থিব অন্যকোন কারণেই হোক্ – বহুবছর মামার কোন খোঁজ নেই। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল- মামা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ইউরোপ-আমেরিকার পথেঘাটে অঢেল মনিমুক্তো কুড়িয়েছেন, সেই সঙ্গে দেশের জন্যে সম্মান। নবেল প্রাইজের মেডালটা তার গলায় ঝুলল বলে।

মামা ঢাকা এসেছেন, সৌজন্য সাক্ষাৎটা খুবই জরুরী। আমার চেয়ে গিন্নীর তাগিদ বেশী। মামা-শ্বশুরকে একবেলা পোলাও কোর্মা না খাওয়াতে পারলে নাকি তার মান থাকে না। তিনি বড়লোকের মেয়ে, চিরদিন আমার আত্মীয়স্বজনদের নাক সিটকিয়ে এসেছেন। সেই তার মধ্যে এমন মামা-শ্বশুরপ্রীতি দেখে যারপরনাই প্রীত হলাম। পাটভাঙা পা’জামা-পাঞ্জাবীতে ফুলবাবু সেজে যখন বেরুচ্ছি তার মুখে এক চিলতে হাসি। আমার বেশভুষা দেখে তার মুখে হাসি ফুটেছে এমন কখনও ঘটেনি। সুতরাং আমার সাজগোজ যে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুব মুড নিয়ে রিক্সায় চেপে বসলাম। এরূপ মুডের যাত্রীদের কাছ থেকেই সাধারনতঃ ডাবল ভাড়া পেয়ে থাকে রিক্সাওয়ালারা।

শেরাটনের সামনে সবেমাত্র নেমেছি, ব্যাটা যেন ঝোপ বুঝে বসেছিল। যাকে বলে একেবারে ‘অঝোর ধারায় বরিষণ’। দৌড়ে লবি পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে আমার মুগীস্নান সারা হয়ে গেছে। ধোপভাঙা পা’জামা-পাঞ্জাবী ভিজে ন্যাতা হয়ে শরীরের সাথে লেপটে গেছে। সদ্য পালিশ করা স্যান্ডেলজোড়ার গা হতে ক্রীম গলে গিয়ে অরিজিনাল রং উকি মারছে। এই বেশে একজন হবু নবেল লরিয়েটের সাথে দেখা করা যায়, হোক সে নিজের আপন মামা !

মামা কিন্তু খুব আন্তরিকভাবেই গ্রহন করলেন আমাকে। আমার মুখে বর্ষার নিন্দা শুনে বললেন- ‘তোরা শহরে বন্দরে মানুষ হয়েছিস, গ্রামবাংলার বর্ষার অকৃত্রিম রূপটি দেখিসনি, তাই নিন্দা করিস। অবশ্য তোদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। আমাদের সময়ের বর্ষার সেই রূপ তো এখন আর নেই। ওহ্, কি ভয়ংকর সুন্দর ছিল সেই রূপ। অথৈ কালো জলের মাঝে গ্রামগুলি ছবির মতো ভেসে আছে। সুপুষ্ট পাট গাছগুলি জলের উপর গলা উচিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে। নধর কালো আমনের ডগাগুলি সবুজ রংয়ের গালিচা পেতে রেখেছে। আকাশটা অনেক নীচে নেমে এসেছে, সেখানে নানা রংয়ের মেঘেদের আনাগোনা, বাজনাবাদ্যি। গ্রাম্য কবিরা কতো

আদরের নাম দিয়েছে সেই মেঘেদের- আড়িয়া মেঘা, হারিয়া মেঘা, কূড়িয়া মেঘা - আরও কতো নাম। গ্রাম্যবালিকাদের গাওয়া সেই গানটির কথা ধর্- 'আড়িয়া মেঘা হারিয়া মেঘা কূড়িয়া মেঘার নাতি, নাকের নোলক বেঁচিয়া দেব তোমার মাথার ছাতি। দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নাম'। আহারে, মেঘ তো না যেন কত জনমের আপন জন যার জন্যে অনায়াসে এত সাধের নোলকটাও বেচে দেয়া যায়। কোথায় যেন পড়েছিলাম- এক ফরাসী সুন্দরী প্যারিস নগরীর বিনিময়ে এমনকি তার প্রেমিককেও ছেড়ে যেতে রাজী হয়েছিল। বলেছিল- 'ওগো আমার প্যারি, তোমার জন্যে ছাড়তে পারি হ্যারি'। ফরাসি সুন্দরী প্যারির (প্যারিসের) জন্যে প্রেমিক হ্যারিকে ছাড়তে রাজী আছে, আর বঙ্গললনা দেয়ার মাথার ছাতা কিনতে প্রেমিকের দেয়া নোলকটা বেচে দিতে চায়। কি অপুর্ব মিল্, তাই না'?

মামার কথায় আমি তাজ্জব! বললাম- 'মামু, ভেতরে ভেতরে তুমি তো এক মহাকবি ! ইকনমিক্সের কাঠখোট্টা থিওরী তোমার মাথায় খেলে কী করে কও দেখি মামু'?
মামা লজ্জিতভাবে বললেন- 'আমাকে বর্তমান অবস্থায় টেনে আনার পেছনেও তোদের ঐ বর্ষারাণী দায়ী। বর্ষার ঘোরে না পড়লে দেশে গদ্যকবির সংখ্যা হয়তো আরেকজন বেড়ে যেতো'।
আমি অবাক হয়ে বলি- 'মামু। লুকোছাপা না করে আসল কথাটা কও দেখি। বিষয়টা খুব ইন্টারেষ্টিং বলে মনে হচ্ছে'।

মামা বললেন- 'তা'হলে শোন্। ক্লাশ টেনে উঠেছি। যদিও মোটে ক্লাশ টেন, বয়েসের দিক দিয়ে বেশ পেঁকে উঠেছি। পুব পাড়ার ননীমাধব চক্রবতীর বাড়ী নিশ্চয়ই দেখেছিস্। বিশাল বাড়ী, বাড়ী তো না যেন বাগান। এমন কোন ফুল নেই যে ননী চক্কোত্তির বাগানে ফুটত না। "গোলাপ চামেলি বেলী" থেকে শুরু করে "কদম্ব ধুতুরা" পর্যন্ত। তবে আমার ইন্টারেষ্ট ছিল অন্যখানে। বুঝতেই পারিস্, কাঁচা বয়েস, মনটা যেন চৈত্ মাসের খা খা করা মাঠ। সেখানে যাই পড়ুক নিমেষেই শুষে নেয়। চক্কোত্তির ছোট মেয়ে কল্পনা। ছোটবেলা থেকেই চোখের উপর বেড়ে উঠেছে, কখনই আহামরি কিছু মনে হয়নি। সেই মেয়েই যেন হঠাৎ করে নুতন রূপে আবির্ভূত হলো আমার চোখে। নাক দিয়ে সিনকি পড়া একটি ন্যাকপ্যাকে বালিকা কী করে রাতারাতি মন পাগল করা কিশোরীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় সে রহস্যটা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না ভাগিনা।

'কল্পনার প্রেমে দেওয়ানা হয়ে গেলাম আমি। লেখাপড়া মাথায় উঠল। দিনের মধ্যে চৌদ্দবার করে ননী বাবুর বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ঘুরে বেড়ানোই সার। ভাব জমানো দুরের কথা, দু'একটা মুখের কথা বলারও উপায় ছিল না। টিন এজটা বড়ো মারাত্মক ভাগিনা। পনের থেকে বিশ- এই বয়েসের ছেলেমেয়েগুলি মারাত্মক আবেগপ্রবন হয়ে থাকে। মনের উপর বিন্দুমাত্র কন্ট্রোল থাকে না, যা চাইবে না পেলে দুনিয়াটাকে তছনছ করে ফেলে।

'তখন ছিল শ্রাবন মাস। আকাশটা এমনি নীচে নেমে এসেছে। বড়ভাই বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজাচ্ছেন। প্যানপ্যানানি গান, শুনলে খুশীর পরিবর্তে খুন করার ইচ্ছা জাগে মনে। তিনি গর্ব করে বলতেন- "রবীন্দর সঙ্গীত, সবলোকে এসব গান বুঝে না"।

'আশ্চর্য্য ! একটা গান হঠাৎই অবশ করে ফেলল আমাকে। পাথরের মতো স্থানু হয়ে গেলাম আমি। -"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়"। ভরাট গলার সেই সুর নিমেষেই আমার মনের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। কার গান এটা ! মনের কথাটি যেন গায়ক সুরের জাল বিছিয়ে মনের গহীন থেকে টেনে বার কওে আনছেন। মনটা হু হু করে উঠল। হায়, সব ঠিক ঠিক মতো আছে। আকাশ হতে ঝরঝর করে বারি ঝরছে, শো শো করে বায়ু বইছে, কল্পনা নামের অপার রহস্যে ঢাকা মেয়েটি তাদের কদম-বকুলে ঘেরা বাড়ীতে স্বশরীরে বিরাজ করছে। সবই আছে, শুধু আমার মনের কথাটিই কি আর বলা হয়ে উঠবে না? লগ্ন যে পার হয়ে গেল। বিশ্বাস করো ভাগিনা, মাথাটা একবারেই আউলা হয়ে গেল আমার'।

-'তারপর'? আমি প্রশ্ন করি।
মামা হেসে উঠলেন। বললেন- 'তার আর পর নাই ভাগিনা। শ্রাবনের কুহকে পড়ে পরদিন জীবনের প্রথম প্রেমপত্রখানা যখন হাতে দিতে গেলাম - সে অবাক হয়ে বলল- কী এটা? সেটা যে কী তা টের পেলাম রাত্রিবেলা। বাবা ভীষণকণ্ঠে বললেন- পনা, এদিকে আয়। তার হাতে আমার সেই প্রেমপত্র যার প্রতিটি অক্ষর একটি কিশোরের বুকের রক্তে রঞ্জিত। হায় নিঠুর, প্রেমের ডাকে না হয় নাই সাড়া দিলি, তাই বলে প্রেমিককে এক বাড়ী লোকের সামনে এমনভাবে খড়মপেটা করাতে হয়! একনিষ্ঠ প্রেমের এই প্রতিদান? মনটা একেবারে বিকল হয়ে গেল ভাগিনা। বাবা লোহা কাঠের খড়ম পরতেন, তার মার চামড়ার উপর দাগ কেটে বসে। সে সওয়া যায়।

কিন্তু কল্পনার হৃদয়হীনতা মনের উপর দাগ কেটে বসলো আমার- তা সওয়া বড্ড কঠিন। ভাবলাম- কী হবে আর এ জীবন রেখে, আত্মহত্যা করে মরে যাব'।
-'কিন্তু তুমি তো আত্মহত্যা করনি মামু, দিব্বী বেঁচে আছ। নবেল প্রাইজের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছ'। আমি বললাম।

-'আত্মহত্যা না করে কীভাবে পালিয়ে ঢাকা চলে আসলাম, কীভাবে এক মার্কিন মেমসাহেবের নেকনজরে পড়ে বিদেশে পাড়ি জমালাম- সে আরেক হিস্ট্রি ভাগিনা। আসল কথা হলো গিয়ে তোমাদের ঐ কুহকিনী বর্ষা। সে তার ভেজা স্যাৎস্যাতে রূপটি নিয়ে আমার মনের উপর চেপে না বসলে প্রেমের রসে আমি এমনভাবে জারিয়ে উঠতাম না, বড়জোর হাটুভাঙা কলেজের পলিটিকাল সায়েন্সের মাষ্টার হতাম আর অঙ্কের মাষ্টার টিউশানি করে দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে এই হিংসায় কলেজের ইন্টারনিসাইন দলাদলিতে জড়িয়ে পড়তাম। সেই সংকীর্ণ বৃত্ত ভেঙে আজ যে আমি এতবড় একটা বৃত্তে বিচরণ করতে পারছি- তার মুলে কিন্তু তোমাদের ঐ বর্ষা- সেটা ভুলো না ভাগিনা'।

বর্ষা যে কতো বিচিত্র পথে বাঙালির জীবনকে প্রভাবিত করে- কিয়াম মামার ঘটনায় তার জ্বাজল্যমান প্রমান পাওয়া গেল। মামার কাহিনী মনের মধ্যে এতটাই দাগ কেটে বসলো যে রাতারাতি বর্ষাপ্রেমিক বনে গেলাম। যেখানেই সুযোগ পাই কালিদাস-রবীন্দ্রনাথকে কোট করে বর্ষার মহত্ব কীর্তন করি। বর্ষার মেঘ যদি রাজী না হতো, তা'হলে যক্ষ কাকে দুত করে অলকায় পাঠাতো? মেঘদুত কাব্য আদৌ রচিত হতে পারতো কি? রবীন্দ্রনাথেরই বা কোন্ গতি হতো? -"ধেয়ে চলে আসে শ্রাবনের ধারা, নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা/ কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে/ গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি ডাকিছে গগনে গগনে" --এই অনুপম ছন্দচিত্রের জন্ম হতো কি? ভেবে দেখুন বর্ষা এসে গেছে তার বাজনাবাদ্যি নিয়ে, নয়া পানির আগমনের সাথে সাথে গ্রামবাংলার মাঠঘাটে বিচরণরত সাত বছরের বালকটির মনে উল্লাসের বাণ ডেকেছে। সে শ্রাবনের ঘোলাজলে শুশুকের মতো দাপাদাপি করছে দিনমান, বরশি দিয়ে পুটিমাছ শিকারে মহাব্যস্ত। বালকের মতো কবিপ্রাণেও দোলা লেগেছে। প্রকৃতিতে যখন সাজ সাজ রব, কবির প্রাণ যখন কানায় কানায় পুর্ণ- আর সকলের কি তখন চুপচাপ বসে থাকা উচিৎ হয়? এমন লগ্ন কি বৃথা যাবে? বঁধুরা উঁলুধ্বনি সহকারে বর্ষাকে বরণ করে নেবে না? প্রিয়সুখভাগিনীরা কেতকীকেশর তেলে কেশপাশ সুরভিত করে কটিদেশে করবী ফুলের মালা জড়িয়ে চোখে কাঁজল এঁকে কদম ফুলের রেনু মাখানো শয্যায় প্রিয়মিলনের প্রস্তুতি নেবে না?
"আনো মৃদংগ মুরজ মুরলি মধুরা, বাজাও শঙ্খ হুঁলুরব দাও বধুরা
এসেছে বর্ষা ওগো নব অনুরাগিনী, ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী, ক্ষীন কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে।"
এভাবেই বর্ষা প্রকৃতির পাতা থেকে সাহিত্যের পাতায় তার প্রভাব নিরঙ্কুশ করে ফেলেছে।

আমার শ্যালিকা একজন জাদরেল ডাক্তার। মানুষ-মারা বিদ্যায় সে অল্পদিনেই এমন পেঁকে উঠেছে যে রোগী সামলাতে চেম্বারে দারোয়ান রাখতে হয়েছে। সে একদিন চট্ করে দুলাভাইকে একটা দামী পাঞ্জাবী প্রেজেন্ট করে বসলো। তার মতে পাঞ্জাবীতে নাকি দারুন হ্যান্ডসাম দেখায় আমাকে। অথচ বর্ষার কল্যানে এক সপ্তাহেই এত সাধের পাঞ্জাবীটাতে গুটি বসন্তের মতো কালো কালো দাগ ফুটে বেরুল। সেটা পরে যে 'ভদ্র ম্যালে' যাব সে উপায় নেই। গিন্নী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন- 'বিড়ালের পেটে কি ঘি হজম হয়? উর্মির মাথা খারাপ, তিন হাজার টাকার কেরাণীর জন্যে আড়ংয়ের পাঞ্জাবী ! হুঃ...'।

কানাকে কানা, খোড়াকে খোড়া বলা যেমন নিষেধ, তেমনি কেরাণীকে কেরাণী বলে খোটা দেয়া অন্যায়- এই অতি সাধারণ জ্ঞানটুকু যার নাই, তার সাথে তর্কে যাওয়া বাতুলতা। সুতরাং খুব অফ মুডে বসেছিলাম।
এমন সময় খান এসে উদয় হলো। বলে রাখি খান একজন ভয়াবহ গদ্যকবি, তার লেখা কবিতা বুঝার ক্ষমতা শতকরা সাড়ে নিরানব্বুই জন লোকের নাই। কবি হিসেবে সে যে কত উপরে এ থেকেই তার প্রমান মেলে।
খান বললো- 'অমন পেঁচার মতো মুখ করে বসে আছিস্ কেন'?

সুযোগ পেয়ে বিস্ফোরিত হলাম আমি- 'তোরা কবিরাই দেশের বারটা বাজিয়েছিস্। একটা পঁচা ঘিনঘিনে ঋতু, তাকে রানী বানিয়ে ফেলেছিস। বর্ষা তোদের জন্যে ভাল, কারণ বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ তোদের মনে কাব্যভাবের জন্ম দেয়। বর্ষা গ্রামের লোকদের জন্যেও ভাল, কারণ বর্ষার অবসরে কয়টা মাস তার ধুমছে মাছ ধরতে পারে, নৌকা বাইচ খেলতে পারে, এমনকি বয়াত গানের জমজমাট আসর বসাতে পারে। বর্ষা রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের জন্যে ভাল, কারণ বন্যা নিয়ে উত্তম বানিজ্য হয়। প্রচুর ডলার পকেটে আসে যা দিয়ে বিবি বাচ্চা

নিয়ে হংকং সিঙ্গাপুরে ঈদ-মার্কেটিংয়ে যাওয়া যায়। বর্ষা গুলশানবাসীদের জন্যে ভাল, কারণ আশুলিয়ার উপচে পড়া পানির তীরে বসে আরামসে বার্গারে কামড় দিতে দিতে লেক বিহারের আনন্দ উপভোগ করা যায়। কিন্তু আমাদের মতো সামান্য লোকদের জন্যে বর্ষা কোন্ উপকার নিয়ে আসে? ভাব্ দেখি, আমার আড়াই হাজার টাকা দামের পাঞ্জাবীটা দু'দিনেই কেমন বরবাদ হয়ে গেল। ভাব্ সেই সব হাজারো পরিবারের কথা যারা প্রমত্তা পদ্মা-যমুনার মুহূর্তের লীলায় ঘরবাড়ী হারিয়ে নিঃস্ব ভিখারি হয়ে গেল। ভাব্ সেই বধুটির কথা যে বন্যায় খেতের সমস্ত ফসল খুইয়ে গোটাকয়েক হাঁসমুরগী কোলে নিয়ে ঘরের চালায় উঠে কোনমতে প্রাণ বাচাচ্ছে। তোদের বর্ষা এইসব লোকদের কী দিয়েছে বল্'?

খান মুচকি হসলো। বললো- 'একটা পাঞ্জাবির শোকেই তুই যে নেতা হয়ে উঠলি রে দোস্ত্, নেতাদের মতো ভাষণ শুরু করে দিলি। ঠান্ডা হ', ভাবীর হাতের এক কাপ চা আসুক। তোর সব কথার জবাব দেব'।
আমি হাসিমুখে বললাম- 'সে আশা ছাড় চাঁন। তোমাদের বর্ষরাণীর আদর খেয়ে সব চিনি গলে জল হয়ে গেছে। যদি চাও তো এক গ্লাশ শরবত আনতে বলে দেই'।

খান ধমক দিয়ে বললো- 'তুই থামবি। চা আসবে না শরবত আসবে সে নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে। শুন্, তুই এতক্ষন যে কথাগুলি বললি তা সবই সত্য- হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। কিন্তু দোস্ত্, একটা জিনিসের শুধু একপাশ দেখলেই তো চলবে না। পুরোটা বুঝতে হলে তোমাকে চারপাশ থেকে দেখতে হবে'।
-'কী রকম'? আমি প্রশ্ন করি।

খান বললো- 'আমাদের এই দেশটার নাম বাংলাদেশ বা বঙ্গাদেশ। জিয়োগ্রাফিকালি এটা একটা পাললিক ভূমি। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বর্ষার মায়ায় উতল হয়ে কোটি কোটি টন পলি বুকে নিয়ে ছুটে চলছে হাজার বছর ধরে, তৈরী করেছে পৃথিবীর বৃহত্তম এক ব-দ্বীপ আদর করে তোমরা যার নাম দিয়েছ সোনার বাংলা। তাদের সেই চিরন্তন কর্মযজ্ঞ এখনও থেমে যায়নি, নুতন সৃষ্টির উন্মাদনায় অবিরাম ভাঙাগড়ার খেলা চলছেই। ভাঙনের দিকটাই শুধু চোখে পড়ে তোমার, কিন্তু সকলের অগোচরে বিশাল সাগরের বুকে সে যে নুতন নুতন ভূমি পত্তন করার চৌহদ্দি টাঙিয়েছে, সেদিকটায় তোমার চোখ পড়ে না।

আমাদের গোটা দেশটা এই ভাঙাগড়া নামক প্রসেসের ফসল -- বর্ষা, নদী আর প্লাবন যার অনুঘটক। তুমি ফলটা ভোগ করবে আর ফলের কারণ যে গাছ তাকে গাল দেবে- তা হয় না। কৃষক বধূ তার হাঁসমুরগী নিয়ে ঘরের চালায় উঠে প্রাণ বাচাচ্ছে সেই শোকে কাতর তুমি। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রকৃতিকে বশ মানানোর যে স্পিরিট বধুটির চোখে লেখা ছিল তা তুমি পড়ে দেখনি। যদি পড়তে, তা'হলে কবির মতো তুমিও গেয়ে উঠতে- 'বাঘের সংগে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় নাঁচি'।

তাই তো ! খান বেটা তো মিছে কথা বলেনি। কবিরা তা'হলে সময়মতো আসল কথাটি ঠোটে নিয়ে ঠিকই এগিয়ে আসে!!

(লেখাটি বেশ কয়েকবছরের পুরোনো। পুরোনো সেই লেখাটিকে সামান্য পরিমার্জন করে মরুপলাশের উপযোগী করে পাঠকদের সমীপে পেশ করা হলো পুনর্বার)

তারিখ- ১লা জুলাই, ২০১০।